দৈনিক ইত্তেফাক

28

03 JUN 1998

তারিখ ... 03 JUN 1998
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৭

অভিমত

জাতীয় শিক্ষানীতি বনাম প্রধানমন্ত্রীর আকাঙক্ষা

এ. এন রাশেদা

হয়েছে। আমরা হারিয়েছি ৩০ লাখ শহীদের সঙ্গে এদেশের শ্রেষ্ঠ সন্তানদের। এত রক্ত! তবু এদেশের মানুষ চেয়েছিল সামান্যই– চেয়েছিল বৈষম্যহীন এক সমাজব্যবস্থা, এদেশের মানুষ চেয়েছিল অসাম্প্রদায়িক সমাজ গড়ে তোলার মানসে এক শিক্ষাব্যবস্থা। তাই '৭২-এর সংবিধানে গৃহীত নীতিমালার ভিত্তিতে গঠিত হয়েছিল ডঃ কুদরাত-এ খুদার নেতৃত্বে শিক্ষা কমিশন। সেই কমিশনের রিপোর্টে শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যাবলি অধ্যায়ে (১·১) বলা হয়েছিল, ''শিক্ষাব্যবস্থা একটি জাতির আশা-আকাঙক্ষা রূপায়ণের ও ভবিষ্যৎ সমাজ নির্মাণের হাতিয়ার। কাজেই দেশের কৃষক, শ্রমিক, মধ্যবিত্তসহ সকল শ্রেণীর জনগণের জীবনে নানা গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজনের উপলব্ধি জাগানো, নানাবিধ সমস্যা সমাধানের যোগ্যতা অর্জন এবং তাদের বাঞ্ছিত নতুন সমাজতান্ত্রিক সমাজ সৃষ্টির প্রেরণা সঞ্চারই আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার প্রধান দায়িত্ব ও লক্ষ্য। এই লক্ষ্য আমাদের সংবিধানের অন্তর্ভুক্ত রাষ্ট্রীয় মূলনীতিসমূহের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। শিক্ষার মূলনীতির সঙ্গে এই সাংবিধানিক নীতিমালার যোগসাধন করে বাংলাদেশের শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যাবলী নিম্নরূপে নির্ধারণ করা যায়।'' এখানে উল্লেখ্য যে, সংবিধানের অন্তর্গত রাষ্ট্রীয় মূলনীতি-সমূহের মধ্যে ছিল জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা। ডঃ খুদা কমিশন রিপোর্টের মূল স্পিরিটকে বোঝার জন্য শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যাবলী অধ্যায়ের 'দেশপ্রেম ও সুনাগরিক' শিরোনামে বক্তব্যটুকু উদ্ধৃত করা প্রয়োজন মনে করছি। ''প্রত্যেক নাগরিককে অবশ্যই তার নিজের দেশকে গভীরভাবে ভালোবাসতে হবে। এই দেশপ্রেম বলতে কোন অস্পষ্ট ভাবাবেগপূর্ণ অনুভূতির কথা বুঝায় না, বাংলাদেশের আদর্শের যথাযথ উপলব্ধির কথাই বুঝায়। এর লক্ষ্য হচ্ছে জাতির ঐতিহ্যে গর্ববোধ করা, তার বর্তমান ভূমিকা সম্পর্কে উৎসাহী হওয়া এবং তার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে দৃঢ় আস্থা পোষণ করা। দেশপ্রেমের মূল মর্ম হচ্ছে প্রত্যেকটি নাগরিক জাতীয় সংহতিবোধে উদ্বুদ্ধ হবে এবং জনগণের সমষ্টিগত আশা-আকাঙ্খার সঙ্গে একাত্ম হয়ে উঠবে। সে অনুভব করবে যে, সে দেশের একজন যেমন সে তার পরিবারের একজন। সে আরও অনুভব করবে যে, দেশের ভাগ্যে ভালোমন্দ যা কিছুই ঘটে তা যেন তার নিজের ভাগ্যেই ঘটেছে।'' এই বক্তব্যের ভেতর দিয়ে ফুটে উঠেছে শিক্ষাব্যবস্থার মধ্য দিয়ে দেশ কি আকাঙক্ষা করছে। অথচ স্বাধীনতার ২৭ বছরে আমরা আজ পেয়েছি– দেশের ক্ষতিসাধন করে শুধু নিজের কল্যাণ কামনায় সদাব্যস্ত উচ্চ ডিগ্রিধারী লোভী–ঘুসখোর–দুর্নীতিবাজ–স্বার্থপর লুটেরা এক গোষ্ঠী; যারা শিক্ষিত নন, মানুষও নন। মনুষ্যত্বহীন ব্যক্তি যেমন মানুষ নয় তেমনি যারা অনেক ডিগ্রি অর্জন করে, অনেক সম্পদ সৃষ্টি করে কিন্তু সমাজ নিয়ে, পরিপার্শ্ব নিয়ে ভাবে না, সমাজের কল্যাণের কথা ভাবে না তারাও তেমনি শিক্ষিত নয়– এ উপলব্ধি নতুন নয়। এখানে লক্ষ্য করার বিষয় যে, কমিটির রিপোর্টের মধ্যে এই আকুতিটুকু পাওয়া যায় না। ''দেশের ভাগ্যের ভালোমন্দ যা ... যেন তার ভাগ্যেই ঘটেছে।'' যদি

এমন করে কেউ না ভাবে তাহলে মুক্তিযুদ্ধের যে চেতনার কথা রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে তা কি কোনদিন বাস্তবায়ন সম্ভবপর হবে?

অথচ আমাদের সরকারপ্রধান শেখ হাসিনা একাধিকবার বলেছেন ডঃ খুদা কমিশনের মূলনীতির আলোকে বর্তমান শিক্ষানীতি তারা উপহার দেবেন।

১৪-০১-৯৭ তারিখে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অফিস আদেশে শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটির কার্যপরিধি সম্পর্কে বলা হয়েছেঃ

(ক) কুদরাত-এ-খুদা কমিশনের প্রতিবেদনকে গভীর এবং নিবিড়ভাবে পর্যালোচনা করে সেই প্রতিবেদনের বিভিন্ন প্রস্তাবসমূহকে যুগোপযোগী করার উদ্দেশ্যে দেশের সর্বপ্রকার ও সর্বস্তরের শিক্ষা সংক্রান্ত সমস্যাদি পরীক্ষা করে একটি বাস্তবভিত্তিক সুষ্ঠু জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন করা এবং সরকারের অনুমোদনের জন্য তা পেশ করা।''

জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটির রিপোর্টের দ্বিতীয় অধ্যায়ে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে (১·২৯) বলা হয়েছে, 'এটা খুবই স্পষ্ট যে, পৃথিবীর যেকোন দেশের শিক্ষাদর্শন রাষ্ট্রীয় নীতির দ্বারা প্রভাবিত হয়। কাজেই শিক্ষা দর্শনের মধ্যে পরিবর্তনশীলতা লক্ষণীয়। আমাদের দেশেও তার ব্যত্যয় ঘটেনি। ১৯৭৫ সালে রাষ্ট্রীয় পরিবর্তন সাধিত হওয়ার পর দেশের ৪টি রাষ্ট্রীয় নীতির ক্ষেত্রে পরিবর্তন সাধিত হয় এবং বাংলাদেশের সংবিধানেও সংশোধনী আসে। এর প্রভাব আমাদের শিক্ষাদর্শনেও প্রতিভাসিত হয়।''

এই বক্তব্যের মধ্য দিয়ে '৭৫-এর নির্মম হত্যাকাণ্ডকে বৈধতা দেয়া হলো না কি, যা এখন বিচারাধীন এবং এই জঘন্যতম অপরাধের সঙ্গে শিক্ষাদর্শনেরও এক যোগসূত্র স্থাপন করা হয়েছে। অথচ সংবিধানের এই পরিবর্তন তো সাংবিধানিক উপায়ে ছিল না। নিরস্ত্র অবস্থায় হত্যার মধ্য দিয়ে যার পরিবর্তন তা কখনই সমর্থনযোগ্য নয়, আদর্শগত তো নয়ই। এই বক্তব্যের মধ্য দিয়ে সমগ্র রিপোর্টটি এক বিরাট প্রশ্নের জন্ম দিচ্ছে।

অথচ দ্বিতীয় অধ্যায়েই 'জাতীয় শিক্ষানীতি ঃ পরিপ্রেক্ষিত, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য'তে বলা হচ্ছে, 'মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় শিক্ষার্থীদের অনুপ্রাণিত করে তোলা', 'বিশ্বভ্রাতৃত্ব, অসাম্প্রদায়িকতা, সৌহার্দ্য ও মানুষে মানুষে সহমর্মিতাবোধ গড়ে তোলা, মানবাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল করে তোলা' এবং গণতান্ত্রিক চেতনাবোধের বিকাশের জন্য পারস্পরিক মতাদর্শের প্রতি সহনশীল হওয়া' বৈষম্যহীন সমাজ সৃষ্টির লক্ষ্যে মেধা ও প্রবণতা অনুযায়ী শিক্ষা লাভের সমান সুযোগসুবিধা অবারিত

করা ইত্যাদি। এর পূর্বের বক্তব্যে যেখানে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় চার রাষ্ট্রীয় মূলনীতি উপড়ে ফেলাকে মেনে নিয়ে শিক্ষাদর্শনে তার প্রতিফলনের কথা নির্বিকারভাবে উল্লেখ করা হচ্ছে আবার এই বক্তব্যে সেই চেতনাতেই শিক্ষার্থীদের অনুপ্রাণিত করার কথা বলা হচ্ছে। বিক্ষিপ্তভাবে পড়লে এই বক্তব্যে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসী মানুষ উৎফুল্ল হবে নিঃসন্দেহে। কিন্তু শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে ধনী-গরিবের জন্য পৃথক ধারার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অর্থাৎ ধনীর সন্তানের জন্য ইংরেজি মাধ্যম ও-লেভেল, এ-লেভেল বা নানা ধারার ব্যয়বহুল স্কুল, প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়, গরিবের সন্তানের জন্য এবতেদায়ী মাদ্রাসা বা মাদ্রাসা, মধ্যবিত্তের জন্য সাধারণ স্কুল-ইত্যাদি রেখে কি ওপরে বর্ণিত লক্ষ্য সাধিত হবে? আবার প্রথম পংক্তিতে শিক্ষার্থীর জীবনে নৈতিক, মানবিক, ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক মূল্যবোধ সৃষ্টির কথা বলা হয়েছে। আমাদের বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীর মধ্যেও গোষ্ঠীগত মতপার্থক্য রয়েছে। যেমন হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে বর্ণ বিভাগ আছে, তেমনি ইসলাম ধর্মেও দেখা যায় কাদিয়ানি খতমের ধ্বনি ওঠে, শিয়া ও সুন্নীর মারাত্মক বিভেদ, খৃষ্টান ধর্মাবলম্বীদের মাঝে ক্যাথোলিক ও প্রটেস্ট্যান্টদের লড়াই ইত্যাদি। তাই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মীয় মূল্যবোধের উদ্দীপনা সৃষ্টি কি সত্যিই বাঞ্ছনীয়?

আর বৈষম্যহীন সমাজ?– তার ভিত্তি কি? এই রিপোর্টে বিভিন্ন উপ-কমিটি কর্তৃক লিখিত রিপোর্টে যেমন নারী শিক্ষা, উচ্চ শিক্ষা, বিজ্ঞান শিক্ষা, কৃষি শিক্ষা, ললিতকলা শিক্ষা, মাধ্যমিক শিক্ষা প্রভৃতি অধ্যায়ের উদ্দেশ্য লক্ষ্য মুক্তিযুদ্ধের চেতনার ধারায় লিখিত হয়েছে। যেমন উচ্চ শিক্ষা অধ্যায়ে (অধ্যায়-৯) বলা হয়েছে, ''উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে সমগ্র দেশের জন্য উন্নয়ন ও কল্যাণ বহনকারী ও সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যমুখী একটি অভিন্ন নীতি প্রণয়ন করা একান্ত জরুরি।'' লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে, উচ্চ শিক্ষার নীতি হবে (২·৪·১) 'সর্বৈব ধর্মনিরপেক্ষ ও অসাম্প্রদায়িক, উদারনৈতিক, মানবমুখী, প্রগতিশীল ও দূরদর্শী।'' (২·৪·৩)- ''সম্পূর্ণ সমাজমুখী অর্থাৎ রাষ্ট্র ও সমাজের সমস্যা সনাক্তকরণে সচেষ্ট ও সমাধান প্রয়োগ উপযুক্ত।'' মাধ্যমিক শিক্ষা অধ্যায়ে বলা হয়েছে- ''অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত অভিন্ন ধারার প্রাথমিক শিক্ষার পরবর্তী এবং ডিগ্রি পর্যায়ের শিক্ষার পূর্ববর্তী স্তর মাধ্যমিক শিক্ষা নামে চিহ্নিত।'' অথচ এই অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত অর্থাৎ প্রাথমিক শিক্ষা স্তরের জন্য প্রস্তাবিত কাঠামোতে (৫০ পৃষ্ঠা) 'মাদ্রাসার ক্ষেত্রে আরবি ও ধর্ম ঃ কেজি স্কুলের ক্ষেত্রে ইংরেজি (অন্তর্বর্তীকালে)' উল্লেখ করে মাদ্রাসা ও কেজি স্কুলকে ...

নিজেদের বাগত নীতিরই বিরোধিতা করা হয়েছে। অর্থাৎ উপ-কমিটিসমূহ এই অভিন্ন ধারার পক্ষে জোরালো বক্তব্য রাখার পরও কিভাবে প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা বহুধাবিভক্ত ঐ পূর্বাবস্থাতেই রয়ে গেল? উচ্চশিক্ষা অধ্যায়ে যে সর্বৈব ধর্মনিরপেক্ষ ও অসাম্প্রদায়িক শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলার অঙ্গীকার- লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অধ্যায়ে ব্যক্ত হলো তা কি তৃতীয় শ্রেণী থেকে বাধ্যতামূলক ধর্মশিক্ষার মধ্য দিয়ে বাস্তবায়িত হতে পারবে? প্রাথমিক অবস্থা থেকেই যখন শিশুদের মধ্যে ধর্মে ধর্মে বিভাজন ঘটিয়ে শ্রেণীকক্ষ থেকে সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃষ্টান ধর্মাবলম্বী বংশের শিশুদের এতিমের মতো মাঠে পাঠিয়ে দেয়ার ব্যবস্থাকে স্বীকার করা হলো, যা পাকিস্তান স্বৈরাচারী আমলে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল-- এর মধ্য দিয়ে কি উচ্চশিক্ষা কমিটির সেই 'অসাম্প্রদায়িক' 'মানবমুখী' আকাঙক্ষা বাস্তবায়িত হবে? অথচ আমাদের দেশে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীর বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান রয়েছে। সেখানে যে যার মতো করে ধর্মীয় শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে। কিন্তু সব ধর্মের মানুষের জন্য যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সেখানে ধর্মে ধর্মে বিভাজন ঘটিয়ে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই একপক্ষীয় ধর্মশিক্ষার ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তাকে বড় করে দেখা কি মূল্যবোধ ও আদর্শগত দিক দিয়ে যুক্তিযুক্ত ও গণতান্ত্রিক?

আবার ঐ অধ্যায়েই বলা হয়েছে 'বিজ্ঞানমনস্কতা এবং সাম্প্রদায়িকতামুক্ত উদার মানবিক দৃষ্টিভঙ্গিকে লালন ও বিকশিত করতে হবে', অন্যদিকে প্রাথমিক পর্যায়েই ধর্মশিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হচ্ছে- ওই বক্তব্যের সঙ্গে এই ব্যবস্থা কি অসঙ্গতিপূর্ণ নয়?

তাই মনে হয়, বর্তমান শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটির রিপোর্ট প্রধানমন্ত্রীর আকাঙক্ষা বাস্তবায়নে সক্ষম হবে না। যারা এ রিপোর্ট তৈরিতে মূল্যবান সময় দিয়েছেন বিভিন্ন উপ-কমিটিতে থেকে তারাও দাবি করছেন পরবর্তীতে সব কমিটি বসে সমন্বয় সাধন করা হয়নি, তাই তাদের অনেক গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য বাদ পড়েছে এবং তাদের আকাঙক্ষারও প্রতিফলন ঘটেনি। তেমনি যারা কোন বিষয়ে জোরালো ভিন্নমত ব্যক্ত করেছেন তাদের সেই মতের পক্ষের যুক্তিগুলোও প্রতিবেদনে পরিশিষ্ট আসেনি- তাহলে বর্তমান এবং পরবর্তী প্রজন্ম জানতে পারত কেন ছিল সেই ভিন্নমত।

এই রিপোর্টে অনেক বিষয়ই অসম্পূর্ণ। যেমন খুদা কমিশনে শিক্ষা প্রশাসন সম্পর্কে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টারূপে এবং পদাধিকারবলে মন্ত্রণালয়ের সচিব পদে একজন শিক্ষাবিদকে নিয়োগ করার কথা বলা হয়েছিল। বলা হয়েছিল শিক্ষা প্রশাসনের সকল পর্যায়ে নীতিগতভাবে উপযুক্ত শিক্ষাবিদদের নিয়োগ এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অফিসারদের পদগুলো শিক্ষাবিদদের দ্বারা পূরণ করার কথা। কারণ হিসেবে বলা হয়েছিল, ''তার দায়িত্বের পেশাগত ক্ষেত্রেই হোক বা প্রশাসন ক্ষেত্রেই হোক সুষ্ঠু সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হলে যে শিক্ষা ব্যবস্থার অধীনে তিনি কাজ করেছেন সে সম্পর্কে এবং অপরাপর দেশের শিক্ষানীতি এবং সমস্যা ও সমাধান সম্বন্ধে তার গভীর জ্ঞান থাকতে হবে।'' এভাবে খুদা কমিশনের

তোলার যে আকুতি পরিলক্ষিত হয় বর্তমান শিক্ষা কমিটির রিপোর্টে তা কতোটুকু ধরা পড়েছে তা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নিশ্চয়ই লক্ষ্য করবেন। মনে হয় তাকে হতাশ ও হতোদ্দমই হতে হবে যদি তিনি তার প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের জারিকৃত অফিস আদেশ অনুযায়ী শিক্ষানীতি জাতিকে উপহার দিতে চান।

কি ছিল সেই অফিস আদেশে? অফিস আদেশে ভূমিকাস্বরূপ বক্তব্যে বর্ণিত হয়েছে....''বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার- শিক্ষার নানাবিধ অভাব ও ত্রুটি-বিচ্যুতি দূরীকরণ, শিক্ষার মাধ্যমে সুষ্ঠু জাতি গঠনের নির্দেশ এবং দেশকে আধুনিক জ্ঞান ও কর্মশক্তিতে বলীয়ান করার পথনির্দেশের জন্য বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ও শিক্ষাবিদ ডঃ মুহাম্মদ কুদরাত-এ খুদার নেতৃত্বে বাংলাদেশ শিক্ষা কমিশন গঠন করেন। পরবর্তীতে তার নির্মম হত্যাকাণ্ডের পর এ বিষয়ে আর কোন কার্যকর পদক্ষেপ নেয়া হয়নি। বর্তমান সরকার ১৯৭৪ সালে প্রস্তুতকৃত কুদরাত-এ খুদা শিক্ষা কমিশনের উক্ত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে একটি বাস্তব, গণমুখী ও যুগোপযোগী শিক্ষানীতি প্রণয়নের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন।'' অথচ শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটির রিপোর্টের দ্বিতীয় অধ্যায়ে শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলতে যেয়ে এই নির্মম হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে সংবিধানের পরিবর্তনকে কেমন যেন সাদরে গ্রহণ করা হল- যা জাতিকে হতাশ ও হতোদ্দম করতে পারে।

কমিটির গঠন নিয়েও অনেকেই প্রশ্ন তুলেছেন। ৫৬ সদস্য নিয়ে কমিটি হয়েছে অথচ খুদা কমিশন গঠিত হয়েছিল ১৮ জন সদস্য নিয়ে মোট ১৯ জন। কে না জানে কমিটির কাজের চাইতে কমিশনের কাজের পরিধি অনেক ব্যাপক। আর অফিস আদেশে সে কথাই ছিল- 'খুদা কমিশনের প্রতিবেদনকে যুগোপযোগী করার'। সব বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর, সব শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যানসহ সরকারি পদে অধিষ্ঠিতজনদের ব্যস্ততা এবং বাকস্বাধীনতা নিয়ে যখন প্রশ্ন থাকে তখন দায়সারা গোছের অর্থাৎ সমন্বয় সাধন ছাড়া রিপোর্ট প্রকাশে বাধা থাকে না। এক্ষেত্রে তার ব্যত্যয় ঘটেনি। তবু বলা যায়, কোন কোন উপকমিটি প্রচুর খেটে '৭১-এর চেতনায় রিপোর্ট তৈরির যে চেষ্টা করেছেন তা একদিকে যেমন সমন্বয়ের অভাবে প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছে অন্যদিকে প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিকের বিষয় তালিকা- কাঠামোগত দিক দিয়ে খুদা কমিশনের সীমাবদ্ধতাকে কিছু ক্ষেত্রে অতিক্রম করতে পারেনি। আবার কোন কোন উপ-কমিটির সুপারিশকৃত ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শকেও মূল কমিটি ধরে রাখতে পারেনি। ও-লেভেল, এ-লেভেল-এর শিক্ষার্থীরা যখন বিষয় বাছাইয়ের অবাধ সুযোগ পাচ্ছে তখন আমাদের এই শিক্ষা কমিটি সেই মান্ধাতার আমালের চেয়েও অধিক হারে শিক্ষার্থীদের আবশ্যিক বিষয়ের বেড়াজালে আটক রাখছে। আর নকল প্রতিরোধের উপায়ই বা কি? তার সুপারিশ কোথায়? পরিশেষে বলা যায়, এখনও অনেক সময় আছে এই রিপোর্টের সব অধ্যায়ের মাঝে সমন্বয় সাধনের এবং একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার জন্য 'প্রস্তুত করে